



Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)

A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture

Volume - vi, Issue - iii, Published on July issue 2026, Page No. 350 - 358

Website: <https://tirj.org.in/tirj>, Mail ID: editor@tirj.org.in

(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 - 0848

পরাদীনতার শৃঙ্খল ভাঙার এক কালজয়ী নাট্য-দলিল উৎপল দত্তের ‘টিনের তলোয়ার’

ড. মৌসুমী পাল

সহযোগী অধ্যাপিকা

স্বামী বিবেকানন্দ মহাবিদ্যালয়, ত্রিপুরা

Email ID: mousumipal1971@gmail.com

0009-0005-7111-9054

Received Date 15. 06. 2026

Selection Date 15. 07. 2026

Keyword

Steel Sword, Meta-theatre, Dramatic Performances Control Act, Political Drama, Artistic Rebellion, Independent Practice of Art, Patriotism, Architectural Style.

Abstract

The play ‘Tiner Talwar’, written and produced by the eminent playwright Utpal Dutt in 1971, serves as a unique artistic commemoration of the centenary of the establishment of the Bengali public theatre (1872). However, it is not merely a nostalgic trip to the past; rather, it is a humble homage to the predecessors who laid the foundation of Bengali theatre while defying extreme social humiliation and state oppression. Despite the contemporary orthodox high society and conservative characters like Bachaspati branding the theatre as a ‘den of sin’ and socially ostracizing the actors and actresses, the playwright demonstrates that it was these marginalized individuals who transformed the theatre into a sacred temple of art.

The backdrop of the play’s creation was deeply influenced by the 1971 Liberation War of Bangladesh, the Naxalbari movement in West Bengal, and Utpal Dutt’s personal political crisis and burden of debt. Breaking away from the limitations of urban drawing-room theatre, he adopted the high melodrama and acting style of rural ‘Jatra’ (folk theatre) as the core artistic framework of this play. Structurally, it is a ‘meta-theatre’ or a play within a play, organized into seven chapters. It depicts the life struggles of characters like ‘Shankari Devi’—who rises from being a vegetable seller named Moyna to becoming the lead actress—the lifeblood of the theatre Beni madhab, and the progressive playwright Priyanath.

The ultimate political significance of the play is unveiled through the inclusion of the infamous Dramatic Performances Control Act of 1876. Defying the capitalist arrogance of the lustful businessman Birkrishna Da and the state terror unleashed by the British police officer Lambert, an unprecedented transformation occurs on stage in the final scene. The farce of ‘Sadhabar Ekadashi’ abruptly turns into the anti-British play ‘Titumir’. The artificial ‘tin sword’ of acting, which was once dismissed by Mathur the sweeper as a mere toy or ‘childish plaything’ of the wealthy Babus, ultimately transforms into a sharp steel weapon for proving the self-determination of an

exploited and subjugated nation. In conclusion, the play becomes an eternal and timeless manifesto of free artistic expression against fascism.

Discussion

বাংলা থিয়েটারের ইতিহাসে ১৯৭১ সাল এবং ১৮৭৬ সাল — এই দুটি বছর দুই ভিন্ন শতাব্দীর প্রতিনিধি হলেও, বিশিষ্ট নাট্যকার উৎপল দত্তের লেখনীতে তারা এক অবিচ্ছেদ্য সমান্তরালে এসে মিলেছে। ১৮৭২ সালের ৭ই ডিসেম্বর কলকাতার ‘ন্যাশনাল থিয়েটার’-এ সাধারণ রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বাংলা নাট্যচর্চা সামন্ততান্ত্রিক বাবুদের ড্রয়িংরুমের খাঁচা ও রাজা-জমিদারদের তোষামোদি থেকে মুক্ত হয়ে সাধারণ টিকিটের বিনিময়ে আপামর জনসাধারণের দরবারে পৌঁছেছিল। সেই গৌরবময় যাত্রার শতবর্ষ পূর্তিকে স্মরণ করে ১৯৭১ সালে উৎপল দত্ত তাঁর নিজস্ব নাট্যদল ‘পিপলস লিটল থিয়েটার’ এর পক্ষে রচনা ও প্রযোজনা করেন যুগান্তকারী নাটক ‘টিনের তলোয়ার’।

এই নাটকটি থিয়েটারের সেই আদি ও অকৃত্রিম পূর্বসূরীদের প্রতি একগভীর ও বিনম্র শ্রদ্ধার্ঘ্য, যাঁরা সামাজিক বর্জন, চরম লাঞ্ছনা, চরম দারিদ্র্য এবং রাষ্ট্রীয় দমনপীড়নকে উপেক্ষা করে নিজের বুকের রক্তে বাংলা নাটকের ভিত রচনা করেছিলেন। নাটকের শুরুতে নাট্যকারের উৎসর্গীকৃত ঐতিহাসিক প্রণতিতেই তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে –

“সাধারণ রঙ্গালয়ের শতবার্ষিকীতে প্রণাম করি সেই আশ্রয় মানুষগুলিকে - যাঁহারা কুষ্ঠগুস্ত সমাজের কোন নিয়ম মানেন নাই, সমাজও যাঁহাদের দিয়াছিল অপমান ও লাঞ্ছনা।”^১

সেকালে থিয়েটার করা বা থিয়েটার দেখা ভদ্রসমাজের চোখে ছিল চরম বখাটেপনা, লাম্পাট্য ও চারিত্রিক স্বলনের লক্ষণ। শুচিবায়ুগ্রস্ত ও রক্ষণশীল সমাজ থিয়েটারকে দেখত সমাজের পক্ষে এক কুৎসিত ব্যাধি ও পাপের আখড়া হিসেবে। তথাকথিত এই ভণ্ড ‘ভদ্রলোক’ সমাজের তীব্র নাট্যবিরোধিতা, ছুঁমার্গ এবং কপট নৈতিকতাকে উৎপল দত্ত অত্যন্ত নিপুণভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। তৎকালীন নব্য-শিক্ষিত ও সনাতনপন্থী উভয় সমাজই থিয়েটারের অভিনেত্রীদের ‘পতিতা’ বা ‘বারাঙ্গণা’ বলে সমাজচ্যুত করে রাখত। কিন্তু নাট্যকার এই নাটকে প্রমাণ করেছেন যে, সমাজের চোখে যারা ছিল ‘মাতাল নট’ আর ‘গণিকা নটী’, তারাই আসলে নিজেদের রক্ত-জল করা শ্রমে, চোখের জলে এবং জীবনের সর্বস্ব ত্যাগের বিনিময়ে বাংলার রঙ্গমঞ্চের বিদ্যার দেবী সরস্বতীর পবিত্র বেদী নির্মাণ করেছিলেন।

‘টিনের তলোয়ার’ তাই একাধারে থিয়েটারের আত্মবীক্ষণ, থিয়েটার কর্মীদের অস্তিত্ব রক্ষার লড়াইয়ের দলিল এবং শোষণের বিরুদ্ধে এক শিল্পিত বিদ্রোহের ইস্তেহার। এই নাটকের অনুপস্থিতিতে বঙ্গরঙ্গমঞ্চের শতবর্ষের রোশনাই কেবল বাহ্যিক জাঁকজমকেই সীমাবদ্ধ থাকত। আমরা কোনোদিনই অনুধাবন করতে পারতাম না যে, কতখানি দুঃখের কাঁটাতার মাড়িয়ে আজকের থিয়েটার তার গৌরবের সিংহাসনে আরোহণ করেছে।

‘টিনের তলোয়ার’ নাটকটি রচনার নেপথ্যে উৎপল দত্তের ব্যক্তিগত নাট্যজীবন এবং তৎকালীন পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক পরিস্থিতি এক গভীর ও জটিল ভূমিকা পালন করেছিল। ১৯৭১ সাল ছিল বাংলার সামাজিক ও রাজনৈতিক ভাগ্যাকাশে চরম দুর্দিনের কাল। ওপার বাংলায় (তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান) তখন চলছে বাংলাদেশের তীব্র মুক্তিযুদ্ধ ও রক্তক্ষয়ী স্বাধীনতা সংগ্রাম, যার ফলে লক্ষ লক্ষ শরণার্থীর ঢেউ আছড়ে পড়ছিল এপার বাংলায়।

অন্যদিকে, পশ্চিমবঙ্গের অভ্যন্তরীণ রাজনীতি তখন উত্তরবঙ্গের ১৯৬৭ সালের নকশালবাড়ি আন্দোলনের বীভৎস ও রক্তাক্ত জের সামলাতে ব্যস্ত। কলকাতা তখন প্রতিদিন রাজনৈতিক খুন, বোমা আর রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের আতঙ্কে কাঁপছে। উৎপল দত্ত নিজে তৎকালীন প্রগতিশীল বামপন্থী আন্দোলনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। মার্ক্সীয় দর্শনে বিশ্বাসী এই নাট্যকার তাঁর রাজনৈতিক মতাদর্শ এবং আপসহীন নাট্যচর্চার কারণে বারেরবারে প্রবল রাষ্ট্রীয় দমনের মুখোমুখি হন, এমনকি কারাবরণও করেন।

১৯৭০ সালে মিনার্ভা থিয়েটারে ‘লেনিনের ডাক’-এর পর নাট্যকারের মাথায় চেপে বসেছিল লক্ষাধিক টাকার ঋণের দুঃসহ বোঝা। থিয়েটার চালানোর আর্থিক সংকট, নিজস্ব নাট্যমঞ্চ হারানো এবং জনবিচ্ছিন্নতার এই চরম মানসিক ও সামাজিক ক্রান্তিকালে দাঁড়িয়ে তিনি বিকল্প মাধ্যমের সন্ধান করতে থাকেন। ১৯৬৮ সাল থেকেই তিনি বুঝতে পেরেছিলেন

যে, শহুরে মধ্যবিত্তের ড্রয়িংরুম থিয়েটারের চেয়ে গ্রামীণ ও সাধারণ শ্রমজীবী মানুষের কাছে পৌঁছানোর সবচেয়ে শক্তিশালী দেশজ মাধ্যম হল যাত্রা। যাত্রাপালার এই চড়া সুর, তীব্র মেলোড্রামা এবং আবেগধর্মী সংলাপের আঙ্গিকে তিনি অত্যন্ত সচেতনভাবে গ্রহণ করেন।

যাত্রাসুলভ এই চড়া আবেগ ও অভিনয়ের ঘরানাটিই ‘টিনের তলোয়ার’ নাটকের মূল শৈল্পিক কাঠামো বা ‘লৈখিক টেক্সচার’ গঠন করেছে। একদিকে নিজের রাজনৈতিক বিশ্বাসের চরম দ্বন্দ্বস্কন্ধতা, ঋণের বোঝা, অন্যদিকে দেশজ নাট্যভাষার সন্ধান এবং থিয়েটারকে আঁকড়ে ধরেই আবার জনসমর্থনের শক্ত মাটিতে উঠে দাঁড়ানোর অদম্য জেদ — এই সমস্ত কিছুর মেলবন্ধনেই জন্ম নেয় ‘টিনের তলোয়ার’। শতবর্ষ আগের দুঃখসহিষ্ণু থিয়েটারকর্মীদের যন্ত্রণার সঙ্গে নিজের সমসাময়িক যন্ত্রণাকে মিলিয়ে দিয়ে উৎপল দত্ত এই নাটকে এক অনন্য ঐতিহাসিক একাত্মতাবোধ প্রকাশ করেছেন।

আঙ্গিক বা কাঠামোগত দিক থেকে ‘টিনের তলোয়ার’ ঐতিহ্যবাহী বা প্রথাগত নাটকের মতো সুনির্দিষ্ট অঙ্ক এবং দৃশ্যের কঠোর বিভাজনে বিন্যস্ত নয়। এর গঠনশৈলী অত্যন্ত আধুনিক ও এক্সপেরিমেন্টাল। নাটকটির দৃশ্যরীতি মূলত আবর্তিত হয়েছে একটি নাট্যদলের মহলা কক্ষ এবং নাট্যমঞ্চকে কেন্দ্র করে। অর্থাৎ, এটি একটি ‘মেটা-থিয়েটার’ বা নাটকের অভ্যন্তরে নাটক। এখানে মঞ্চের আড়ালে থাকা আসল মানুষগুলোর জীবনের অভিনয় আর মঞ্চের ওপর অভিনীত চরিত্রের কৃত্রিম অভিনয় — এই দুইয়ের সীমানা বারেবারে মুছে গেছে। চরিত্রের অভিনয়ের আড়ালে লুকিয়ে থাকা আসল মানুষগুলো প্রথমে স্বপ্ন দেখে, তারপর সেই স্বপ্নভঙ্গের চরম যন্ত্রণায় নীল হয় এবং পরিশেষে সমস্ত গ্লানি ও ভীর্ণতা ঝেড়ে ফেলে নতুন আশার উদ্দীপনায় প্রোজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

নাটকটিতে মোট সাতটি অধ্যায় রয়েছে, যা নাটকের সামগ্রিক আখ্যানকে এক গতিশীল বৃত্তে আবদ্ধ করে। প্রথম অধ্যায়ে দেখা যায় কলকাতার রাজপথে ‘দি গ্রেট বেঙ্গল অপেরা’র আগামী নাটক ‘ময়ূরবাহন’-এর পোস্টার লাগানোর মধ্য দিয়ে নাটকের সূচনা ঘটে। পৌরাণিক ও কাল্পনিক কাহিনীর চটকদার প্রচারের আড়ালে যে থিয়েটারের তীব্র আর্থিক দৈন্য ও প্রধান অভিনেত্রী-সংকট লুকিয়ে আছে, তা শুরুতেই স্পষ্ট হয়। নটবরের পোস্টার লাগানোর ব্যর্থ চেষ্টা এবং থিয়েটারের অভ্যন্তরীণ সংকটের ইঙ্গিত এই দৃশ্যকে বাস্তবসম্মত করে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে দৃশ্যপট সরে আসে চিৎপুরে বেঙ্গল অপেরার মহলা কক্ষে। এখানে দর্শক পরিচিত হন থিয়েটারের মূল চালিকাশক্তি বেণীমাধব এবং অন্তহীন দুঃখের ধাত্রী বসুন্ধরার সঙ্গে। এখানেই প্রিয়নাথের লেখা দেশপ্রেমমূলক নাটক ‘পলাশীর যুদ্ধ’-এর পাণ্ডুলিপিকে মূল্যায়নের বদলে মুড়ির ঠোঙায় পরিণত করতে দেখা যায় বেণীকে। এই অধ্যায়টির শেষভাগে সবজি বিক্রেতা অশিক্ষিত মেয়ে ময়নার আগমন ঘটে, যার ভেতরের সুগুণ প্রতিভাকে চিনে নিয়ে বেণীমাধব তাকে থিয়েটারের আগামী দিনের প্রধানা অভিনেত্রী ‘শঙ্করী দেবী’ করে তোলায় ঐতিহাসিক ঘোষণা দেন।

তৃতীয় অধ্যায়ে কাহিনী চলে আসে শোভাবাজারের ‘দি বেঙ্গল অপেরা’র মূল মঞ্চে, যেখানে ‘ময়ূর বাহন’ নাটকের উদ্বোধনী প্রদর্শনীর আগের মুহূর্তের চূড়ান্ত বিশৃঙ্খলা ও ব্যস্ততা চিত্রিত হয়েছে। দৃশ্যপট, আলো, কনসার্ট ও পোশাকের গোলমালের মাঝে নবাগতা ময়না রাজকন্যা অনুরোধের সাজে প্রচণ্ড ভয়ে কাঁপতে থাকে। এই গ্রীণরুমে একদিকে থিয়েটারের অবক্ষয় ও অন্যদিকে বসুন্ধরা ও বেণীর কড়া শাসনে ময়নাকে মঞ্চের উপযোগী করে তোলার এক তীব্র মনস্তাত্ত্বিক টানাপোড়েন ধরা পড়ে।

চতুর্থ অধ্যায়ে ময়নার সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটে সমাজের সবচেয়ে প্রান্তিক স্তরের প্রতিনিধি কলকাতার ম্যানহোল পরিষ্কারকারী মথুর মেথরের। মথুর এই থিয়েটারকে ‘ছেলে মানুষি’ বলে মন্তব্য করে। মথুরের এই সংক্ষিপ্ত উপস্থিতি নাটকের মোড় ঘুরিয়ে দেয়। সে থিয়েটারের এই কৃত্রিম রাজা-রানীর সাজ ও তলোয়ারের আঞ্চালনকে বাস্তববিচ্ছিন্ন বাবুদের খেলা বলে উপহাস করে ময়না ও বেণীর অবচেতনে এক বিরাট ধাক্কা দেয়।

পঞ্চম অধ্যায়ে কাহিনী পুনরায় ফিরে আসে বেণীবাবুর সাজঘরে, যা একদিকে জাঁকজমক আর অন্যদিকে শোষণের অন্ধকার কুঠুরি। গড়গড়া ও উজ্জ্বল বাতির আলোর বিপরীতে ঘরের কোণে আধা-অন্ধকারে বসে থাকতে দেখা যায় থিয়েটারের প্রধান অর্থদাতা ও কামুক ব্যবসায়ী বীরকৃষ্ণ দাঁ-কে। বেণীমাধব যখন থিয়েটার বাঁচানোর তাগিদে ‘সধবার

একাদশী’ নাটকের নিমিষাঙ্গের সংলাপ আউরে চলেছেন, ঠিক তখনই পর্দার আড়ালে ময়নার সঙ্গে প্রিয়নাথের ঘর বাঁধার স্বপ্নকে চূর্ণ করে ময়নাকে বীরকৃষ্ণের রক্ষিতা হতে বাধ্য করার নীল নকশা তৈরি হয়।

ষষ্ঠ অধ্যায়ে এই অধ্যায়ে বেণীমাধবের নাট্যভাবনার এক আমূল রূপান্তর লক্ষ্য করা যায়। সে বীরকৃষ্ণের দেওয়া অর্থে নতুন থিয়েটার গড়লেও প্রিয়নাথের লেখা সাহেব-বিরোধী, ঔপনিবেশিক শাসন-বিরোধী নাটক ‘তিতুমীর’-এর স্টেজ রিহাসালে মগ্ন হয়। নিষ্ক্রিয় পৌরাণিকতার খোলস ছেড়ে বেণী এখানে ব্রিটিশ-বিরোধী আশ্রয়ে সংলাপে তিতুমীরের চরিত্রকে জীবন্ত করে তোলে। জলদ রাউত ও বসুন্ধরাও এই অভিনয়ে যোগ দেয়, আর ময়না অবতীর্ণ হয় শোষিত ভারতের প্রতীক ‘বঙ্গলক্ষ্মী’র ভূমিকায়।

সপ্তম অধ্যায়ে নাটকের চূড়ান্ত ও ক্লাইমাক্স দৃশ্য। প্রেক্ষাগৃহে ‘সধবার একাদশী’র অভিনয় চলছে। জলদ ও বেণী যথাক্রমে অটল ও নিমিষাঙ্গের ভূমিকায় অবতীর্ণ। দর্শকের আসনে বসে আছেন ইংরেজ পুলিশ সাহেব ল্যামবার্ট এবং দেশীয় দালাল বীরকৃষ্ণ দাঁ। অভিনয় চলাকালীন হঠাৎই থিয়েটারকর্মীদের ভেতরের পুঞ্জীভূত ক্ষোভ ও দেশপ্রেমের বিস্ফোরণ ঘটে। ‘সধবার একাদশী’র সংলাপ মাঝপথে থামিয়ে বেণীমাধব হঠাৎ কোমরে থাকা কাঠের বা টিনের তলোয়ার উন্মুক্ত করে ‘তিতুমীর’-এর ব্রিটিশ-বিরোধী জ্বালাময়ী সংলাপ বলতে শুরু করেন। মুহূর্তে বদলে যায় নাটকের দৃশ্যপট। বক্সের আসন থেকে ময়না বঙ্গলক্ষ্মীর বেশে এসে সেই বিদ্রোহে যোগ দেয়। ল্যামবার্ট সাহেব ধমক দিয়ে, রক্তচক্ষু দেখিয়ে এই অভিনয় বন্ধ করতে চাইলেন। কিন্তু সমস্ত ভয়কে উপেক্ষা করে, থিয়েটারের টিনের তলোয়ারকে স্বাধীনতার আসল অস্ত্রের ধার দিয়ে নট-নটীরা মঞ্চ কাঁপিয়ে তোলে। সেই ঐতিহাসিক প্রতিবাদের আগুনে যবনিকা পতিত হয়।

‘টিনের তলোয়ার’ নাটকের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক দিকটি হল ১৮৭৬ সালের কুখ্যাত ‘নাট্য নিয়ন্ত্রণ আইন’ এর অন্তর্ভুক্তি। উৎপল দত্ত এই কাল্পনিক থিয়েটার দলের আখ্যানের মধ্যে নিখুঁতভাবে বুনে দিয়েছেন বাংলার বাস্তব নাট্য-ইতিহাসের এক কলঙ্কময় অধ্যায়কে। নাটকে প্রিয়নাথ ও বেণীর কথোপকথনে এই আইনের পটভূমিটি জীবন্ত হয়ে উঠেছে -

“প্রিয়।। গ্রেট ন্যাশনাল ‘গজদানন্দ’ ধরেছে।

বেণী।। সেটা আবার কি? (হঠাৎ কি মনে হতে) গজ! এবার এস্টেজে হাতি তুলবে নাকি?

প্রিয়।। পুরো কলকেতা যা নিয়ে আলোচনা করছে, এই বেঙ্গল অপেরার দুর্গের মধ্যে সেটা এসে পৌঁছয়নি এখনো।”^২

এই ‘গজদানন্দ’ আসলে কোনো কাল্পনিক নাটক নয়, এটি ১৮৭৬ সালে কলকাতার ‘গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে’ অভিনীত বাস্তব প্রহসন ‘গজদানন্দ ও যুবরাজ’। এর নেপথ্যের ইতিহাসটি অত্যন্ত লজ্জাজনক ও রাজনৈতিক ভাবে সংবেদনশীল ছিল। ১৮৭৫ সালের শেষের দিকে ব্রিটিশ যুবরাজ কলকাতায় এলে, হাইকোর্টের বাঙালি উকিল জগদানন্দ মুখোপাধ্যায় রাজভক্তি প্রদর্শনের আতিশয্যে যুবরাজকে নিজের অন্তরে নিয়ে যান। তৎকালীন রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের নিয়ম ভেঙে বাড়ির মহিলারা শঙ্খধ্বনি ও ছলুধ্বনি দিয়ে সাহেবকে বরণ করেন। গোলামির এই চরম পরাকাষ্ঠা ও চাটুকারিতাকে ব্যঙ্গ করে উপেন্দ্রনাথ দাস ও নাট্যকর্মীরা ‘গজদানন্দ ও যুবরাজ’ প্রহসনটি মঞ্চস্থ করেন।

‘টিনের তলোয়ার’ নাটকে যখন বীরকৃষ্ণ এসে বেণীকে জানায় যে, গ্রেট ন্যাশনের অভিনেতার গ্রন্থার হয়ে গেছে এবং ‘তিতুমীর’ নাটক করা যাবে না, তখন এই বাস্তব ইতিহাস নাটকের গায়ে রাজনৈতিক সত্যের সিলমোহর লাগিয়ে দেয়। উৎপল দত্ত দেখিয়েছেন যে, ব্রিটিশরা ভেবেছিল আইনের শিকল দিয়ে থিয়েটারের সৃষ্টিশীলতাকে স্তব্ধ করে দেওয়া যাবে। কিন্তু সৃষ্টির জোয়ারকে শাসকশক্তির রক্তচক্ষু কোনদিন দমাতে পারেনি। ‘টিনের তলোয়ার’-এর সমাপ্তি দৃশ্যটি আসলে সেই ঐতিহাসিক সত্যেরই শৈল্পিক রূপান্তর, যেখানে আইনি নিষেধাজ্ঞা ও জেলের ভয়কে তুচ্ছ করে থিয়েটার হয়ে ওঠে বিপ্লবের আসল ময়দান।

থিয়েটারের অভিনয়ে ব্যবহৃত কাঠের বা টিনের তৈরি যে কৃত্রিম তলোয়ারকে সাধারণ মানুষ ‘ছেলেমানুষি’ বা খেলনা বলে মনে করে, সেই টিনের তলোয়ারই যখন শোষিত মানুষের অন্তরের পুঞ্জীভূত ক্ষোভ ও দেশপ্রেমের বারুদের

স্পর্শ পায়, তা আসল ইস্পাতের তরবারির চেয়েও ধারালো হয়ে ওঠে। শাসক ও শোষক শক্তি এই কৃত্রিম তলোয়ারের আফলানেই নিজেদের সিংহাসন কেঁপে উঠতে দেখেছিল, আর সেই ভয়েই তারা জারি করেছিল নাট্য নিয়ন্ত্রণ আইন।

নাটকে ‘টিনের তলোয়ার’ কথাটি প্রথম শোনা যায় মথুর মেথরের কণ্ঠে। কলকাতার ম্যানহোল পরিষ্কারকারী মথুরের কাছে থিয়েটারের রাজা-রানীর যুদ্ধ এবং পৌরাণিক সংলাপ ছিল বাস্তববিচ্ছিন্ন বাবুদের বিলাসিতা মাত্র। তাই সে বেণীকে সটান প্রশ্ন করেছিল –

“এত নেকাপড়া করে টিনের তলোয়ার বেঁধে ছেলেমানুষি করো কেন?”^৩

শুরুতে বেণী বা ময়নার কাছে এই প্রশ্নের গভীরতা স্পষ্ট না হলেও, নাটকের শেষ দৃশ্যে মথুরের সেই প্রশ্নের উত্তর মেলে। যেদিন ‘দি বেঙ্গল অপেরা’র মঞ্চের বীরকৃষ্ণের অর্থ ও ল্যামবার্টের ক্ষমতার দম্ভকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে বেণীমাধব ‘সধবার একাদশী’র প্রমোদ-সংলাপ ছেড়ে ‘তিতুমীর’এর ব্রিটিশ-বিরোধী বিদ্রোহের বাণী উচ্চারণ করেন, সেদিনই থিয়েটারের সেই সাধারণ টিনের তলোয়ার রূপান্তরিত হয় স্বাধিকার প্রমাণের শাণিত অস্ত্রে।

দ্বিতীয় দৃশ্যে মহলা কক্ষের দেওয়ালে যে বাঁকা তলোয়ারগুলি নিছক সস্তা সাজসজ্জা হিসেবে ঝুলছিল, বা আত্মরক্ষার জন্য ব্যবহৃত হয়েছিল, নাটকের শেষে তা-ই হয়ে ওঠে পরাধীন দেশের শত্রু তথা সাম্রাজ্যবাদের বুকে আঘাত করার মূল হাতিয়ার। তরবারির চেয়েও শক্তিশালী যে শাণিত ভাষা ও থিয়েটারের মঞ্চ, তা সত্যকারের অস্ত্রের চেয়েও মারাত্মক। উৎপল দত্ত দেখিয়েছেন, এই টিনের তলোয়ারের প্রতীকী রূপটি আসলে পরাধীন জাতির দেশজ মুক্তির ও আত্মমর্যাদা প্রতিষ্ঠার অমোঘ হাতিয়ার।

‘টিনের তলোয়ার’ নাটকের ঘটনাংশ যতখানি জোরালো, তার চরিত্রগুলি ততখানিই জীবন্ত, দ্বন্দ্বমুখর ও বহুমাত্রিক। প্রতিটি প্রধান ও অপ্রধান চরিত্রের পারস্পরিক সংঘাতের মধ্য দিয়েই নাটকের রাজনৈতিক ও সামাজিক বার্তাটি পূর্ণতা পেয়েছে। বেণীমাধব ‘দি থ্রেট বেঙ্গল অপেরা’র সর্বসর্বা, একাধারে নাট্যশিক্ষক ও প্রধান অভিনেতা। অভিনয়ে তিনি তৎকালীন বাংলার গ্যারিক বা গিরিশচন্দ্র ঘোষের প্রতিরূপ। কিন্তু তার চরিত্রের একটি মস্ত বড় ট্রাজেডি হল তার আকর্ষণ মদ্যপানের অভ্যাস। তেরো বছর বয়সে থিয়েটারে পা রাখার পর থেকে গাঁজা, চরস ও আফিমের নেশায় তিনি বুঁদ হয়ে থেকেছেন। থিয়েটার ছাড়া তিনি জীবনে আর কিছুই বোঝেন না। নিজের জাত বা ধর্ম সম্পর্কে তাঁর অত্যন্ত স্পষ্ট ও গর্বিত উক্তি –

“আমি বামুন নই, দেখলেন? আমার জাত হচ্ছে থিয়েটারওয়ালা, অভিনয় বেচে খাই।”^৪

বেণীমাধব চরিত্রটি এক চরম বৈপরীত্যে গড়া। একদিকে তিনি থিয়েটার চালানোর জন্য, টিকিট বিক্রির জন্য এবং ধনী পৃষ্ঠপোষক বীরকৃষ্ণ দাঁ-কে খুশি রাখতে নিজের কন্যাসমা স্নেহের পাত্রী ময়নাকে বীরকৃষ্ণের রক্ষিতা করে দিতে দ্বিধা করেন না। আপাতদৃষ্টিতে এই কাজটিকে চরম নিষ্ঠুর ও অনৈতিক মনে হলেও, বেণীর মনস্তত্ত্বের গভীরে ছিল থিয়েটারকে বাঁচানোর এক মরিয়া চেষ্টা। তিনি ভাবতেন, একজনের সম্বন্ধে মূল্যে যদি একটা গোটা থিয়েটার বাঁচে, এতগুলো গরিব কুশীলবের মুখে অল্প জোটে, তবে সেই ত্যাগ স্বীকার করতেই হবে।

কিন্তু বেণীমাধব কেবলই থিয়েটার বেচে খাওয়া ব্যবসায়ী নন, তাঁর মধ্যে রয়েছে একজন খাঁটি শিক্ষকের শিল্পসত্তা। সোনাগাছির পতিতা মানদাসুন্দরীকে ‘নীলদর্পণ’-এর ক্ষেত্রমণি বা সবজিওয়ালি ময়নাকে রাজকুমারী অনুরাধারূপে গড়ে তোলার অলৌকিক ক্ষমতা তারই ছিল। মঞ্চকে তিনি ‘জলসাঘর’ নয়, বরং ‘নাট্যমন্দির’ বলে মনে করতেন। তাই মঞ্চের দাঁড়িয়ে যখন তিনি কামুক বাবুদের শিস বা কোলাহল শোনেন, তখন গর্জে উঠে বলেন –

“মেয়েছেলে চান তো কাছেই বিশেষ পাড়া আছে, সেখান স্বচ্ছন্দে গমন করতে পারেন। এটা নাট্যমন্দির।

জলসাঘর নয়। এখানে পূজারীর ভাব নিয়ে বসতে হয়। না পারলে বেরিয়ে যান।”^৫

নাটকের শেষভাগে বেণীমাধব চরিত্রের এক অভাবনীয় উত্তরণ ঘটে। প্রিয়নাথের দেশপ্রেমের আদর্শ, ময়নার আত্মত্যাগ এবং থ্রেট ন্যাশনালের অভিনেতাদের গ্রেপ্তারের খবর তাঁর ভেতরের ঘুমন্ত শিল্পী ও দেশপ্রেমিককে জাগিয়ে তোলে। ভীরা ও আপসকামী বেণীমাধব মুহূর্তের মধ্যে রূপান্তরিত হন বিদ্রোহী ‘তিতুমীর’-এ। বীরকৃষ্ণের দাসত্ব ও ব্রিটিশ ল্যামবার্টের

রক্তচক্ষুকে তুচ্ছ করে যখন তিনি টিনের তলোয়ার উঁচিয়ে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন, তখন তিনি কেবল একালের নট থাকেন না, হয়ে ওঠেন বিপ্লবের মহানায়ক।

বীরকৃষ্ণ দাঁ ‘দি গ্রেট বেঙ্গল অপেরা’র স্বত্বাধিকারী এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের কলকাতার ক্ষয়িষ্ণু, রুচিহীন ও লম্পট ‘বাবু’ সংস্কৃতির সার্থক প্রতিনিধি। লক্ষ্মীর কৃপায় অগাধ ধনসম্পত্তির মালিক বীরকৃষ্ণ মনে করত যে, টাকা দিয়ে সাহিত্যের দেবী সরস্বতী বা থিয়েটারের নটী — সবকিছুকেই কিনে নেওয়া যায়। তার পোশাক, চলাফেরা ও কথাবার্তার মধ্যে এক উগ্র রুচিহীনতার ছাপ স্পষ্ট। তার চার ঘোড়ার ব্রহ্ম গাড়ি, কুলীন ওয়েলার ঘোড়া, এবং মার্কিন সওদাগরের পাঠানো রূপোর গ্লাসে খাওয়া দুর্মূল্য ‘আনসি’ মদের দেমাক দেখিয়ে সে গরীব অভিনেতাদের প্রতিনিয়ত অপমান করে। দীনবন্ধু মিত্রের মতো কালজয়ী নাট্যকারকে সে অত্যন্ত কুরুচিকর ভাষায় আক্রমণ করে বলে –

“সে লিখতে জানে না। চূড়ান্ত রকমের অশ্লীল। তাছাড়া কলকাতার বাবুদের ব্যঙ্গ করেছে ও পালায়।

আমাদের গাল দেবে আর আমরাই টাকা ঢালবো, এমন মামাবাড়ির আদার চলতে পারে না।”^৬

বীরকৃষ্ণের কাছে থিয়েটার কোনো শিল্প নয়, এটি হল টাকা খাটানোর ব্যবসা এবং সুন্দরী অভিনেত্রীদের ফাঁদ পেতে ধরার আখড়া। মানদা থিয়েটার ছেড়ে দেওয়ায় সে ক্ষুব্ধ হয় এবং ময়নার রূপ দেখে তাকে নিজের রক্ষিতা বা ‘টুকটুকি’ বানানোর জন্য আট হাজার টাকা দিয়ে নতুন থিয়েটার হল তৈরি করে দেওয়ার টোপ ফেলে। ময়নাকে নিজের ঘরে বন্দি করে সে প্রতিদিন মারধর করে, অথচ নিজের অহংকার দেখানোর জন্য তাকে দামি বস্ত্রে বসিয়ে থিয়েটার দেখায়।

বীরকৃষ্ণ হল সেই স্বার্থপর ‘বেনিয়া’ শ্রেণী, যারা নিজেদের স্বার্থে দেশের স্বাধীনতা বা নেশনের সম্মানকে বিক্রি করতে পারে। গ্রেট ন্যাশনালের অভিনেতারা গ্রেপ্তার হলে সে ভয়ে সিঁটিয়ে গিয়ে প্রিয়নাথের নাটক বন্ধ করতে বলে এবং ‘সধবার একাদশী’র মতো অহিংস প্রহসন করার জন্য জোর দেয়। কিন্তু নাটকের শেষে এই মহাশক্তিশালী পুঁজি ও দম্ভের চরম পরাজয় ঘটে থিয়েটারকর্মীদের সমবেত প্রতিরোধের আঙনে।

প্রিয়নাথ ‘টিনের তলোয়ার’ নাটকের সবচেয়ে প্রগতিশীল, আধুনিক এবং বহুমাত্রিক চরিত্র। সে হিন্দু কলেজের প্রাক্তন ছাত্র, যে ইংরেজি নাটকের পাঠ নিয়েছে এবং পার্ক স্ট্রিটের সাঁসুসি থিয়েটারে অভিনয় করেছে। তার মুখে অনায়াসে চলে আসে ইংরেজি উদ্ধৃতি। কিন্তু প্রিয়নাথ কেবল বাবু সংস্কৃতির অনুকরণকারী নয়, সে মূলত এক বিদ্রোহী সত্তা। পারিবারিক লোহার ব্যবসার প্রাচুর্য ও পিতৃতন্ত্রের শৃঙ্খল ভেঙে সে থিয়েটারে এসেছে সমাজকে বদলাবার হাতিয়ার হিসেবে নাটককে ব্যবহার করতে।

প্রিয়নাথ কেবল সমালোচক নয়, সে প্রথাগত নাটকের অঙ্ক ও দৃশ্য-বিভাজনের কৃত্রিম নিয়ম ভেঙে দশ অধ্যায়ের এক নতুন নাট্য-আঙ্গিকের জন্ম দেয়, যা একাধারে নাটক ও নভেল। ‘পলাশীর যুদ্ধ’ থেকে শুরু করে ‘তিতুমীর’ — তার প্রতিটি সৃষ্টির মধ্যেই লুকিয়ে ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের ভিত কাঁপিয়ে দেওয়ার বারুদ। প্রেমিক হিসেবেও প্রিয়নাথ খাঁটি। সে ময়নাকে ভালোবেসে বিয়ে করে এক সাধারণ, সুস্থ জীবন কাটাতে চেয়েছিল। কিন্তু থিয়েটারের স্বার্থে ময়নার এই বলিদানের পর প্রিয়নাথ থিয়েটার ছেড়ে চলে যায় এবং ঘোড়ার আস্তাবলে কাজ নিয়ে এক চরম বাস্তব ও কঠিন জীবন বেছে নেয়। কিন্তু থিয়েটারে সে না থাকলেও, তার লেখা ‘তিতুমীর’ নাটকের পাণ্ডুলিপিই শেষ পর্যন্ত বেণী ও ময়নার অবচেতনে বিদ্রোহের আঙন জ্বালিয়ে দেয়।

ময়না চরিত্রটি এই নাটকের আসল কেন্দ্রবিন্দু এবং নাট্য-আখ্যানের মূল চালিকাশক্তি। কলকাতার নোংরা রাস্তায় আলু-বেগুন বিক্রি করা এক অতি-সাধারণ, অশিক্ষিত মেয়ে থেকে থিয়েটারের মঞ্চ কাঁপানো ‘শঙ্করী দেবী’ এবং পরবর্তীতে বীরকৃষ্ণের বিলাসী খাঁচার বন্দি ‘টুকটুকি’ — তার এই জীবন-পরিচয় ঊনবিংশ শতকের প্রথম যুগের বিনোদিনী দাসী বা তিনকড়ি দাসীদের ট্রাজিক জীবনের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। শুরুতে থিয়েটার বলতে সে কেবল বুঝত — মুখে রং মেখে রানীর মতো সেজে স্টেজে ঘোরাফেরাকে। তাই বেণীবাবুর কড়া শাসন, শুদ্ধ উচ্চারণের মহড়া এবং পাট মুখস্ত করার কঠিন পরিশ্রমে সে বিরক্ত হয়ে বলত —

“এসব থেটার ফেটার আমার ভালো লাগছে না।”^৭

কিন্তু ধীরে ধীরে বেণীর যোগ্য শিক্ষায় তার ভেতরের সুপ্ত নারীত্ব ও রাজকীয় প্রতিভা বিকশিত হয়। সে যখন মঞ্চে সফল হয়, তখন তার চোখে থিয়েটারের জগৎটাই শ্রেষ্ঠ মনে হয়, এমনকি সে দুর্ভিক্ষপীড়িত ভিখারিদের এড়িয়ে যাওয়ার মতো অহংকারও অর্জন করে।

কিন্তু ময়নার জীবনের আসল ট্রাজেডি শুরু হয় যখন থিয়েটার বাঁচানোর জন্য তাকে পণ্য হিসেবে বীরকৃষ্ণের হাতে তুলে দেওয়া হয়। নিজের সতীত্ব ও প্রেমকে বিক্রি করে দেওয়ার এই চরম অপমানে তার অন্তর ব্যথিত হয়। থিয়েটারের এই কর্পোরেট ও নগ্ন পণ্য-সংস্কৃতিকে বিদ্রূপ করে সে তীব্র ক্ষোভে বসুন্ধরাকে বলে –

“রাস্তায় যখন আলু বেচতাম তখন কারুর সাহস হয়নি আমাকে জিজ্ঞেস পর্যন্ত না করে আমাকে দোকানে পসরা করে দেবে।”^৮

পুরোনো জীবনে ফিরে যাওয়ার পথ বন্ধ জেনেও ময়না কিন্তু শেষ পর্যন্ত হেরে যায়নি। নাটকের শেষ দৃশ্যে যখন সে দেখে বেণীমাধব ভয়ে থিয়েটারকে বিক্রি করে দিচ্ছেন, তখন সে তীব্র ধিক্কার জানায়। আর যখন ‘সধবার একাদশী’র মঞ্চে আসল বিদ্রোহের মুহূর্ত আসে, তখন সে আর বীরকৃষ্ণের ‘টুকটুকি’ থাকে না, সে হয়ে ওঠে তিতুমীরের ‘বঙ্গলক্ষ্মী’। তার অবচেতনের রুদ্ধদ্বার ভেঙে বেরিয়ে আসে শোষণের বিরুদ্ধে সত্যিকারের প্রতিবাদের আগুন।

নাটকে বসুন্ধরা ‘দি গ্রেট বেঙ্গল অপেরা’র মেরুদণ্ড। অতীতে ‘আঙ্গুর’ নামের পতিতা জীবন থেকে থিয়েটারের হাত ধরে তার উত্তরণ ঘটেছিল অভিনেত্রী বসুন্ধরায়। অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফি ও বেলবাবুর মতো নাট্যগুরুদের কাছে দীক্ষিত বসুন্ধরা থিয়েটারকে নিজের প্রাণের চেয়েও বেশি ভালোবাসে। তাই চরম আর্থিক অনটনে যখন দল তুলে দেওয়ার কথা ওঠে, সে অত্যন্ত গর্বিত ও দৃঢ় স্বরে নটবরকে বলে –

“বেঙ্গল অপেরা ওঠে না, তুলে দেওয়া যায় না।”^৯

বসুন্ধরা কেবল অভিনেত্রী নয়, সে এই ভবঘুরে, অভাবী নাট্যদলের সবার অন্তর্গত বা জননী। মুদির দোকানের বাকী শোধ করতে নিজের শেষ সম্বল ল্যাম্পটি বিক্রি করতেও সে দ্বিধা করে না। ময়না ও প্রিয়নাথের প্রেমের প্রতি তার এক প্রচ্ছন্ন মাতৃসুলভ মমতা ছিল। নিজের জীবনের অপূর্ণ স্বপ্নকে সে ময়নার মধ্যে দেখতে চেয়েছিল। তাই ময়নাকে রাজকুমারী সাজানো থেকে শুরু করে, স্টেজে নামার আগে ভয়ে কাঁপতে থাকা ময়নাকে চড় মেয়ে অভিনয়ের জগতে ঠেলে দেওয়া – সবকিছুই সে করে একাধারে শাসন ও সোহাগে।

তবে নারীত্বের অপমানে সে সবচেয়ে বেশি গর্জে ওঠে। বেণী যখন থিয়েটারের হলের জন্য ময়নাকে বীরকৃষ্ণের কাছে বিক্রি করার সিদ্ধান্ত নেয়, তখন বসুন্ধরা বজ্রাহত হয়ে চিৎকার করে ওঠে –

“মেয়েটাকে বেঁচে দিলেন বাবু?”^{১০}

থিয়েটারের চেয়ে নারীর ইজ্জত ও মাতৃত্ব তার কাছে অনেক বড় ছিল। নাটকের শেষ দৃশ্যে সেও প্রথাগত অভিনয়ের খোলস ছেড়ে তিতুমীরের বিপ্লবী সৈনিকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। তার কণ্ঠে শোষিত ও ধর্মিতা নারী এবং পরাধীন স্বদেশের আতর্নাদ এক হয়ে মিশে যায়। ‘টিনের তলোয়ার’ নাটকের সার্থকতা কেবল এর প্রধান চরিত্রগুলির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং নাট্যকার উৎপল দত্ত বেশ কিছু অপ্রধান চরিত্রকে এমন সুচারুভাবে তৈরি করেছেন, যা নাটকের সামগ্রিক আবহ ও রাজনৈতিক দর্শনকে আরও স্পষ্ট করে তোলে।

জলদ রাউত চরিত্রটি ঊনবিংশ শতাব্দীর থিয়েটারের সেই পেশাদার অভিনেতাদের প্রতিনিধি, যাঁরা কেবল অর্থের বিনিময়ে এবং অভিনয়ের স্বার্থেই বেঁচে থাকেন। জলদ অভিনয়ে দক্ষ, ‘সধবার একাদশী’র অটলের চরিত্রে সে অনন্য। শুরুতে তাকে অত্যন্ত স্বার্থপর ও সুযোগসন্ধানী মনে হয়। মোদির দোকানে বাকি বা থিয়েটারের আর্থিক অনটনে সে সবচেয়ে বেশি শোরগোল করে। ময়নার উত্থানে সে ঈর্ষান্বিত হলেও তার অভিনয়ের প্রশংসা করতে বাধ্য হয়। কিন্তু নাটকের শেষ দৃশ্যে, জলদ রাউতের ভেতরের পেশাদারিত্বও দেশপ্রেমের জোয়ারে খড়কুটোর মতো ভেসে যায়। বেণীমাধব যখন তিতুমীরের ডায়ালগ বলতে শুরু করেন, জলদও ল্যাম্বার্টের রক্তক্ষুণ্ণ ভয় না পেয়ে নিজের অটলের অভিনয় ছেড়ে সেই মরণপণ প্রতিরোধে शामिल হয়।

নটবর চরিত্রটি থিয়েটারের নেপথ্যের সেইসব কর্মীদের প্রতীক, যাদের নাম কোনোদিন পোস্টারে বড় করে ছাপা হয় না, কিন্তু যাদের ছাড়া থিয়েটারের চাকা সচল থাকা অসম্ভব। পোস্টার লাগানো, কস্টিউম গোছানো, আলো বা সিনের তদারকি করা - নটবর সর্বত্র উপস্থিত। সে যেমন দলের চরম দুর্দিনে বসুন্ধরাকে দল তুলে দেওয়ার বাস্তব পরামর্শ দেয়, তেমনি আবার দল যখন টিকে যায়, তখন সে নিজের সর্বশক্তি দিয়ে মঞ্চকে সাজিয়ে তোলে। নটবরের মধ্য দিয়ে উৎপল দত্ত থিয়েটারের নেপথ্য কারিগরদের প্রতি তাঁর গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছেন।

উৎপল দত্তের নাটকের একটি প্রধান শক্তি হল তার ধারালো, গতিশীল এবং কাব্যিক সংলাপ। ‘টিনের তলোয়ার’ নাটকে তিনি তিনটি ভিন্ন স্তরের সংলাপ ব্যবহার করেছেন — প্রথমত, বাবু ও সাহেবদের ইংরেজি মিশ্রিত চাটুকারিতার ভাষা, দ্বিতীয়ত, থিয়েটার কর্মীদের ঘরোয়া অভাব-অনটন ও মেলোড্রামাটিক ভাষা এবং তৃতীয়ত, নাটকের ভেতরে অভিনীত ‘তিতুমীর’ বা ‘সধবার একাদশী’র শাণিত ক্লাসিক্যাল সংলাপ।

নাটকের সবচেয়ে রাজনৈতিকভাবে বিস্ফোরক সংলাপটি আসে শেষ দৃশ্যে, যেখানে বেণীমাধব নিমচাঁদের অভিনয় করতে করতে হঠাৎ তিতুমীরের সংলাপে আবর্তিত হন –

“যতক্ষণ এক ফিরিঙ্গি শয়তান দেশের পবিত্র বুকো পা রেইখে দাঁড়গে থাকবে, ততক্ষণ এই ওয়াহাবি তিতুমীরের তলোয়ার কোষবদ্ধ হবে না কখনো।”^{১১}

এই সংলাপটি কেবল নাটকের ভেতরের চরিত্রের নয়, এটি সরাসরি ১৯৭১ সালের প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে কলকাতার দর্শকদের উদ্দেশ্যে উৎপল দত্তের নিজের রাজনৈতিক আহ্বান।

উৎপল দত্তের ‘টিনের তলোয়ার’ নাটকটি কেবল একটি ঐতিহাসিক পুনর্নির্মাণ বা অতীতের স্মারক নয়, এটি আসলে যে কোনো সময়ের স্বাধীন শিল্পচর্চা এবং ফ্যাসিবাদের রাষ্ট্রশক্তির মধ্যকার চিরন্তন দ্বন্দ্বের এক কালজয়ী দলিল। নাটকটি আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় যে, থিয়েটার বা শিল্প যখনই তার চারপাশের বাস্তব সমাজ ও রাজনৈতিক শোষণকে বাদ দিয়ে কেবল অলীক স্বর্গ বা সস্তা বিনোদনে মগ্ন হয়, তখনই তার নৈতিক অবক্ষয় ঘটে। কিন্তু যখনই রাষ্ট্র তার কালো আইন বা ক্ষমতার দস্ত দিয়ে মুক্তচিন্তা ও শিল্পীদের কণ্ঠরোধ করতে আসে, তখনই শিল্পের সেই সাধারণ খেলনা টিনের তলোয়ার রূপান্তরিত হয় গণবিপ্লবের আসল অগ্নি-অস্ত্র।

নাটকের শেষে মঞ্চ কাঁপিয়ে যে তুমুল জয়ধ্বনি ওঠে, তা কেবল বেঙ্গল অপেরার জয় নয়, তা আসলে শোষণের বিরুদ্ধে শোষিতের, অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায়ের এবং পরাধীনতার বিরুদ্ধে স্বাধীনতার চিরন্তন জয়। উৎপল দত্ত অত্যন্ত সফলভাবে প্রমাণ করেছেন যে, নটের হাতের তলোয়ারটি টিনের হতে পারে, কিন্তু তার ভেতরের দেশপ্রেম, শিল্পসত্তা এবং প্রতিবাদের আগুনি খাঁটি ইস্পাতের। আর এই কারণেই সৃষ্টির বহু বছর পার হয়েও ‘টিনের তলোয়ার’ আজ সমভাবে প্রাসঙ্গিক, প্রদীপ্ত এবং বিশ্বজুড়ে প্রতিটি প্রগতিশীল নাট্যকর্মীর অনুপ্রেরণার এক অফুরন্ত উৎস।

Reference:

১. দত্ত, উৎপল, ‘টিনের তলোয়ার’, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা - ৭৩, প্রথম প্রকাশ, ১৪১২, পৃ. ০২
২. তদেব, পৃ. ৫৩
৩. তদেব, পৃ. ০৮
৪. তদেব, পৃ. ০৭
৫. তদেব, পৃ. ৪২
৬. তদেব, পৃ. ৩০
৭. তদেব, পৃ. ৩৩
৮. তদেব, পৃ. ৫৮
৯. তদেব, পৃ. ১২

১০. তদেব, পৃ. ৫৮

১১. তদেব, পৃ. ৭৪

Bibliography:

দত্ত, উৎপল, 'টিনের তলোয়ার', মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা - ৭৩, প্রথম প্রকাশ, ১৪১২
দে, অপূর্ব, (সম্পাদনা), 'টিনের তলোয়ার ইম্পাতের তলোয়ার', বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা - ৯, প্রথম প্রকাশ, ২০০৭
ভট্টাচার্য, আশুতোষ, 'বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস' (২য় খন্ড), এ মুখার্জি এন্ড কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা
১২, তৃতীয় সংস্করণ, ১৯৭১

সহায়ক লিংক :

<https://bn.wikipedia.org/wiki>

<https://daakbangla.com/criticism/utpal-theke-suman-tiner-tolowar>

<https://amarbangla.academy/2020/12/12/tiner-tolowar-natok>